চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক বাংলা গদ্য আখ্যানে মনসা-কথার নবনির্মাণ

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা গদ্যের নিদর্শন পাওয়া গেলেও এর যথাযথ প্রয়োগ ঘটে ঊনিশ শতকের সূচনালগ্নে (১৮০১)। পোর্তুগীজ মিশনারীদের (মানোএল দা আসসুম্প সাঁও, দোম আন্তেনিও-দো-রোজারিও) হাতে বাংলা গদ্যের প্রসারের সূত্রপাত হলে পূর্ণতালাভ করে শ্রীরামপুর মিশনারীর পণ্ডিতবর্গ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিদের হাতে। এই বাংলা গদ্যের হাত ধরেই অবসান ঘটে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গতানুগতিক কাব্য মাধ্যমের। আধুনিককালের নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধাবলী রচিত হয় এই গদ্যের আকারেই। মানুষের মনের অভিব্যক্তিগুলি সহজভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এই গদ্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে। এমনকি পদ্যের আকারে রচিত প্রাগাধুনিক রচনাগুলিও নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হতে থাকে গদ্যের আকারে। এরকমই একটি রচনা হল শ্রদ্ধেয় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের 'বেহুলা' নামক গদ্য আখ্যানটি। প্রাচীন যে মনসামঙ্গলের ধারা, তাকে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেওয়ার যে প্রয়াস, তা গদ্যের আকারেই শুরু হয়। এই প্রচেষ্টার কারণেই সার্থক হয়ে উঠেছে আধুনিক গদ্য-আখ্যানে মনসাকথার নবনির্মাণ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপে মনসাকথার নবনির্মাণের আলোচনায় আমরা প্রথমেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব **দীনেশচন্দ্র সেনের 'বেহুলা'** (১৯০৭) আখ্যানটির কথা বলতে পারি। প্রথম দিকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা, প্রখ্যাত সাহিত্যাধ্যাপক এবং অন্যতম এই সাহিত্য স্রষ্টার প্রাগাধুনিক সাহিত্যের প্রতি ছিল ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতুহল। যার পরিচয় পাই 'পৌরাণিকী' (১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রন্থটির 'বেহুলা', 'জড়ভরত', 'সতী', 'ফুল্লরা', 'ধরা-দ্রোণ' ও কুশধ্বজ' প্রভৃতি রচনাগুলির মধ্য দিয়ে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন আমাদের চির পরিচিত প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্যকে নিয়ে রচনা করেন 'বেহুলা' উপাখ্যানটি। কাব্যের আকারে রচিত যে মনসামঙ্গল আখ্যান, বাঙালীর সেই ঘরের কথাকে বিশ শতকের প্রথমার্ধে নানা গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে গদ্যের আকারে রচনা করেন এক আধুনিক আখ্যান।

কানা হরিদত্তকে মনে করলে প্রায় সাতশত বৎসর পূর্বে এই মনসাগান রচিত হয়। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, এমনকি আসাম-বিহারেও এই গানের মহাভাব অনুরণিত হয়। এখনও বাঙালির অনেক ঘরে শ্রাবণ মাসে এই মনসাপূজা হয়ে থাকে। তবে বাংলার আত্মার আত্মীয় ঐতিহ্যশালী এই সম্পদটি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের মধ্যেই থেকে গেছে। যে গান শত শত বছর ধরে দেশের মানুষকে

আনন্দ দিয়ে এসেছে, এই গানের লহরী বাংলার বাতাসে বাতাসে ধ্বনিত হয়েছে। অথচ অনেকেই এই সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তাই আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন 'বেহুলা' রচনাটির ভূমিকায় বলেছেন—

> ''স্বদেশের এরূপ পুরাতন ও পরিচিত ভাবের সঙ্গে যাঁহাদের কোনও সংস্রব নাই, তাঁহাদিগকে খাঁটি স্বদেশী বলিব কি প্রকারে এবং তাঁহারাই বা দেশের প্রতিনিধি বলিয়া সর্বত্র পরিচয় দিবেন কি ভরসায়?''[১]

মনসা ভাসানে অনেক কথাই আছে, সমস্ত বিষয় বর্ণনা করতে গেলে রচনাটি অযথাই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাই তিনি অনেক অংশই বাদ দিয়েছেন। প্রাচীন পুঁথির স্বামী-বিরহ-বিধুরা, আশ্চর্য-সাধনা-তৎপরা, একান্ত বিপন্না অথচ নির্ভীকহৃদয়া স্বাধ্বীর চরিত্র চিত্রণে গুরুত্ব দিয়েছেন। আসলে বাল্মীকি রামায়ণের সীতা চরিত্রের মতোই বেহুলাও ভক্তির রসে অভিষিক্ত হয়েছে লেখকের মানসপটে। আখ্যানটি আলোচনা করলে আমরা এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটি দেখতে পাবো।

মনসামঙ্গলের কাহিনী নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের ২২ টি অধ্যায়ের সুবৃহৎ আখ্যান 'বেহুলা'। মনসার সাথে বিবাদের কারণে চাঁদ ছয়পুত্র ও বৈদ্যরাজ 'শঙ্কুর গারুড়ী'কে হারায়। নিরাশ্রয় চাঁদ তবুও শিবভক্ত বলে নিজ সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন। অন্যদিকে লক্ষ্মীর প্রাসাদতুল্য চাঁদের বিশাল প্রাসাদ সনকার হাহাকার ও ছয় বিধবা পুত্রবধূর নীরব ক্রন্দনে শ্মশানে পরিণত হয়। এতে চাঁদের বজ্রকঠোর পণ শিথিল না হয়ে বরং শোকার্ত হৃদয়ে হেতালের লাঠি নিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় চাঁদ চট্টগ্রামের নাবিকগণের সাহায্যে সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে বাণিজ্যে যান। কালীদহের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ডুবে যায় তাঁর সপ্তডিঙা মধুকর। চাঁদ মনসার সাহায্য না নিলে গভীর জলে নিমজ্জিত হয়ে কোনো রকমে প্রাণটুকু নিয়ে নগ্নদেহে বেঁচে ওঠে। পরে বন্ধু চন্দ্রকেতুর বাড়িতে গিয়ে উঠলে সেখানে মনসার ঘট দেখে বেরিয়ে পড়েন। এই অবস্থায় ক্ষুধিত চাঁদ গ্রামে ভিক্ষা করে রান্নার সামগ্রী জোগাড় করলে মনসাদেবী মুষিকের সাহায্যে তা নষ্ট করে ফেলেন। ক্রুদ্ধ বণিককুল চক্রবর্তী চাঁদ শেষে নদী তীরে বসে কদলীর পরিত্যক্ত ছোবড়া খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন। কিছু টাকা উপার্জনের জন্য কাঠুরিয়াদের সাথে কাঠ কাটতে গেলে দেবীর চক্রান্তে চাঁদ সেই কাঠ বহন করতে পারেননি। এমনকি ব্রাহ্মণ বাড়িতে কাজে নিযুক্ত হলেও সেখান থেকে বিফল হয়ে ফিরে আসেন। একে একে সমস্ত বিপদের মধ্য দিয়ে নিঃস্ব হাতে কোনরকম প্রাণটুকু নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। চাঁদ বাড়িতে ফিরে এলে সনকা মনসাদেবীর কাছে প্রার্থনা করেন এমন একজনকে এনে দিতে যে চাঁদ সদগরকে মনসা পূজার জন্য প্রেরণা যোগাতে পারবে। দেবীর আশীর্বাদে সনকা পুত্র সন্তান লাভ করেন। লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখার ফাঁদ-স্বরূপ পুত্রের নাম

'লক্ষ্মীন্দ্র' রাখেন। আদর করে লোকে বলে 'লখাই'। এর থেকে আরো সংক্ষিপ্ত হয় 'নখা'। তবে দৈবজ্ঞের কাছে চাঁদ জানতে পারেন বাসর ঘরে লখীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে। একা চাঁদ এই মহা পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করেন কাউকে কিছু না বলে। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা চাঁদ-সনকার পুত্র লখীন্দরের রূপ বর্ণনার কথা পাই। নবযৌবনে উত্তীর্ণ লখাই সদাগরের গৃহে দীপশিখার মতো। চাঁদের বিরাট প্রাসাদ গৃহ লক্ষীন্দরের রূপে গুণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র 'চন্দ্রধরের' বাড়ির গৌরব নয়, বিশাল চম্পক নগরীরও গৌরব। গল্পের শুরু থেকেই মনসামঙ্গল কাব্যের ধারাবাহিক অনুসরণ করলেও এই স্থলে লেখক নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সনকা পুত্রের বিয়ের জন্য চাঁদ সদাগরকে অনুরোধ করেন। নানা আপত্তি সত্ত্বেও সদাগর শেষে বিয়ে দিতে সম্মত হয়।

অন্যদিকে নিছনিনগরের বণিক্ সায় সদাগরের চতুর্দ্দশ বৎসরের কন্যা 'বেহুলা নাচুনি'। বেহুলাকে লেখক এখানে চণ্ডীদাসের সেই ধ্যানশীলা রাধার সঙ্গে তুলনা করেছেন। বেহুলা স্বয়ং যেন এক কল্যাণময়ী দেবী। আখ্যানভাগের বর্ণনায় আমরা পাই—

> ''মেয়ে দেখিয়া চাঁদের চক্ষু জলপূর্ণ হইল; মেয়ে ত নয়, এ যেন পদ্মাসন ছাড়িয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণী ভূতলে দাঁড়াইয়াছেন, পায়ের আলতা নহে, উহা রক্ত পদ্মের প্রভা। এই বধূকে পাইলে সনকার প্রাণ সত্য সত্যই জুড়াইবে।''[২]

আসলে হিন্দু গৃহিণীর প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, তা এই আখ্যানে উঠে এসেছে। তার কিঞ্চিৎ আভাস এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। বেহুলার জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যা পরবর্তী আলোচনাগুলিতে আরো তুলে ধরতে পারব। মেয়ে মনোমত হলেও কৌলিক প্রথা অনুযায়ী বেহুলাকে লোহার কলাই রান্নার কথা বলেন চাঁদ। মনসার পূজারী বেহুলা দেবপ্রসাদে এই লোহার কলাই সিদ্ধ করে লখীন্দরের যোগ্য প্রমাণিত হয়। দৈবজ্ঞের বাণীকে মাথায় রেখে চাঁদ সাঁতালী পর্বতে লোহার বাসর-ঘর নির্মাণ করেন। কিন্তু মনসা নানা ছল চাতুরী করে, কামিলাকে ভয় দেখিয়ে সূক্ষ্ম ছিদ্র তৈরি করিরে নেন। আবার বেহুলা-লখীন্দরের বিয়ের সময় নানা অশুভ লক্ষ্মণগুলিও চাঁদ সদাগরকে চিন্তিত করে তোলে। যেমন বরযাত্রী বেরোনোর সময় চৌকাঠে লেগে লখীন্দরের মুকুট খুলে যায়, আবার বিবাহ সভায় হেমছত্র ভেঙে পড়ে। শেষে বিবাহ সম্পন্ন হলে চাঁদ পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে সাঁতালী পর্বতে লোহার বাসর ঘরে নিয়ে যায়। এই অধ্যায়ে বেহাই সাইবেনের সাথে কথোপকথনে চাঁদের পিতৃহৃদয়ের হাহাকার উঠে এসেছে। অন্যদিকে দেখা যায় লোহার বাসর ঘরে বেহুলা একে একে বঙ্করাজ, কালদন্ত ও উদয়কাল সাপকে বন্দী করলেও শেষ রাত্রে কালনাগিনী লখীন্দরকে দংশন করে। আর এই স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য বেহুলা কলার

মান্দাসে ভেসে যায় গাঙ্গুড়ের জলে। এখান থেকেই বেহুলার সত্যের পথে যাত্রা শুরু। যারা এতক্ষণ তাকে খণ্ড কপালিনী, চিরণদাতিনী বলে গালিগালাজ করেছে, তারাই বেহুলার জন্য 'হায় হায়' করে চোখের জল ফেলে। সবাই বেহুলাকে সতী সাবিত্রী সাধ্বী রমণী বলে গুণগান করতে থাকে। বেহুলা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাসর ঘরে হৈমথালায় যে ভাত রেধেছিলেন তা দাড়িম গাছের তলায় পুঁতে রাখার কথা বলে। সেই সঙ্গে স্বামীকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে মৃতদেহ নিয়ে নদীতে ভেসে যায়। পুত্র লখীন্দর ও পুত্রবধূ বেহুলা ভেলায় ভেসে গেলে চাঁদ সদাগর উন্মাদের মতো সাঁতালী পর্বতের বনে বনে ভ্রমণ করে বেড়ায়। অন্যদিকে নিছনিনগরের বেহুলার মা অমলা কর্কশকণ্ঠে কাকের ডাক শুনে বেহুলার অমঙ্গলের কথা ভেবে চিন্তিত হন। বেহুলার একনিষ্ঠতা ও পাতিব্রত্যতার পরিচয় পাই আমরা, যখন বড়দাদা হরি সাধু বাড়ি ফিরে যেতে বললে তার উত্তরে বেহুলা বলে—

> ''মাকে বলিও, যাঁহার হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার সঙ্গেই আছি, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তেও বাঁচিতে পারিব না।''[৩]

লখীন্দরের গলিত শব নিয়ে গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যাওয়ার সময় নানা বিপদের মধ্যে পড়ে বেহুলা। গোদার ঘাটে গোদার কুপ্রস্তাব, কলার ভেলা পচে যাওয়া এবং ফেরু ও ব্যাঘ্রদলের সম্মুখে নানা অসুবিধার মধ্যে পড়ে। তবে দেবীর কৃপায় নতুন ভেলা প্রস্তুত হয়। বেহুলার নিজের রূপ ও দেহের বল নিঃশেষ হয়ে পড়লে, মাতা অমলাকে স্মরণ করে বিষহরির কাছে প্রার্থনা করলে সমস্ত কিছু ফিরে পায়। ছয়মাস ধরে মৃতদেহ নিয়ে যাত্রাকালে লখীন্দরের হাড়মাত্র অবশিষ্ট থাকলেও বেহুলা অন্তর থেকে বুঝতে পারে তার স্বামী জীবিত হয়ে উঠবে। এই সময় বেহুলার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে। গত সাতজন্ম ধরে বাসর ঘরে সে স্বামীকে হারিয়েছে এবং চিতান প্রাণ ত্যাগ করেছেন। অতীতের এই পূণ্যফলে এইবার স্বামীকে ফিরে পাবে বলে বিশ্বাস। তাই স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য মৃত্যুর দ্বারদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছে, আশা ছাড়েনি। যার ফলে প্রতিবাদী দেবতাও তাঁর তপস্যার প্রীত হয়েছেন।

চৌদ্দতম অধ্যায়ে আমরা দেখি বেহুলা নেতা ধোপানীর সাহায্যে দেবসভায় গিয়ে উপস্থিত হয়। দেবতাদের সম্মুখে বেহুলার নৃত্য, স্বর্গের নর্ত্তকীদের নৃত্য থেকে আলাদা। এই নৃত্য সম্পূর্ণ আলাদা। এর রস স্থায়ী। স্বর্গে দ্বিতীয় অমৃতভাণ্ডের সৃষ্টি। এই নৃত্যের কারুণ্য ও স্নিগ্ধতা দেবতাদের উপর পূণ্য প্রভাব ফেলে। আখ্যানের মতো, দেবতারা নিজেদের উপভোগের জন্য নয়, বেহুলাকে পরীক্ষা করার জন্য নৃত্যের আদেশ দেন। পরীক্ষায় বেহুলা উত্তীর্ণ হলে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আশীর্বাদ

দেন দেবতারা। এই স্থলে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে বেহুলার পাতিব্রত্যতা, সতীত্ব, আদর্শ, সত্যতা, একনিষ্ঠতার জন্য দেবতারা আগে থেকেই মুগ্ধ হয় এবং লখীন্দরকে জীবিত করার সংকল্প করেন। তাই দেবসভায় আগেই প্রতিশ্রুতি দেন দেবী মনসা লখীন্দরকে জীবিত করার। তবে মহাদেবের আদেশ, চাঁদ সদাগর পূজা না দিলে দেবীর পূজা জগতে প্রচার লাভ করবে না। মনসা চাঁদের পূজা পাওয়ার চেষ্টা করেন, যার ফলে তাকে অনেক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। চাঁদের দুর্ব্যবহারের জন্যই তাঁর ছয়পুত্রকে সর্পে দংশন করেছে, বন্ধু শঙ্কুর গারুড়ীকে সর্পে দংশন করেছে। সপ্তডিঙা মধুকর সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছে। অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরকে সর্পে দংশন করে। চাঁদ অনায়াসেই 'হিন্তালের লাঠি' দ্বারা মনসার ঘট ভাঙেন, দেবীকে কীটপতঙ্গের ন্যায় নগন্য মনে করেন, ঘৃণা করেন। এই অবস্থায় মনসাদেবী কোন যুক্তিতে চাঁদের পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দিবেন? এই দোলাচলতার মধ্য দিয়ে দেবীর চোখ জলে টলটল করতে থাকে। এমতাবস্থায় মহাদেব আশ্বস্ত করলে দেবী লখীন্দর সহ চাঁদের অন্য ছয় পুত্র এবং সপ্তডিঙার বদলে চৌদ্দডিঙা মধুকর ফিরিয়ে দেন। তবে বিষহরি দেবী বেহুলাকে শর্ত করিয়ে নেন। যেমন—

> ''তোমার শ্বশুর যদি আমার পূজা না করে, তবে যাহা দত্ত হইল, তাহা সকলই হারাইবে।''[৪]

বেহুলা জীবিত স্বামী ও ভাসুরদের নিয়ে প্রথমে যোগি-যোগিনী বেশে নিছনি নগরে যায়। পরে চৌদ্দডিঙ্গা নিয়ে চম্পক নগরে উপস্থিত হয়। চাঁদ সদাগরের বাড়িতে 'লখাইয়ের ষড়মাসিক' শ্রাদ্ধ-কার্য্যে মূল্যবান ব্যজনী হাতে সুন্দরী ডুমুনী ছদ্মবেশে উপস্থিত হয় বেহুলা সবাইকে নিয়ে। বেহুলা শ্বশুরকে পূজা দিতে অনুরোধ করলে, চাঁদ শিবভক্ত বলে মনসাপূজা করতে অসম্মত হন। এই আখ্যানের নতুনত্বের দিক হল শিব স্বয়ং গলিতচর্ম্ম শীর্ণকায় বৃদ্ধের ছদ্মবেশে চাঁদকে উপদেশ দেন শিবমায়া স্বরূপা মনসাদেবীকে স্বীকার করে নিতে, তাঁকে প্রণাম করতে। এই বৃদ্ধ পরে শিবের মহামূর্ত্তি ধারণ করে আকাশ পথে দেদীপ্যমান হয়ে চাঁদকে বলেন—

> ''তুমি মনসাকে আমার আত্মজা বলিয়া জানিও, তুমি তাঁহার মুখ দেখিবে না ও দক্ষিণ হস্তে তাঁহার পূজা দিবে না বলিয়াছ, মুখ ফিরাইয়া বামহস্তে অঞ্জলি দিলেই তিনি প্রীতা হইবেন।''[৫]

চাঁদ শেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শিবাত্মজা দেবীর পূজা নিজ হাতে করে জীবন সার্থক করার অঙ্গীকার করেন এবং মনসাদেবীর সুবর্ণবিগ্রহ তৈরি করে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে পূজা করতে প্রস্তুত হন। পরে হেতালের লাঠি আগুনে পুড়িয়ে সেই কাঠ মনসাপূজার

ধূনাতে ব্যবহার করেন।

আখ্যানের শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখি চাঁদ সদাগরের বাড়িতে আনন্দ উৎসবের মধ্যে চন্দ্রধরের জ্ঞাতি ভ্রাতা উচ্চ বংশের দর্পে স্ফীত নীলাম্বর বণিক ও কুটিল সমাজনীতি প্রাজ্ঞ নরখণ্ডবাসী জনার্দ্দন রায় বেহুলার সতীত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। সভায় সতীত্ব পরীক্ষার প্রশ্ন উঠলে বেহুলা নিজে থেকে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সভাগৃহ থেকে আলৌকিক ভাবে বদ্যিুৎমালায় অলঙ্কৃত হয়ে বেহুলা ও লখীন্দর স্বর্গপথে যাত্রা করেন। বেহুলা-লখীন্দর যে দেব সভায় দেবরাজের অভিশাপগ্রস্থ উষা-অনিরুদ্ধ, তা আখ্যানের শেষে বর্ণিত হয়েছে। আটজন্ম ধরে মর্ত্যের বিরহ ব্যথা সহ্য করে শেষে মুক্তিলাভ করেন।

শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বেহুলা' গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন—

> ''আধুনিক রুচিতে স্ত্রী চরিত্রের আদর্শ যেরূপ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে প্রাচীন একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের এই অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্তের প্রতি বঙ্গসাহিত্যে অবহেলার ভাব না আসিয়া পড়ে, ইহাই প্রার্থনীয়। বেহুলা প্রায় সাত শত বৎসর কাল বঙ্গীয় নারী-সমাজের আরাধ্য হইয়া আছেন এবং আশা করি চিরকালই থাকিবেন।''[৬]

লেখক আরাধ্য এই নারীর জীবনচিত্র অঙ্কন করাই মুখ্য হিসাবে নিয়েছেন উক্ত আখ্যানে। চাঁদ সদাগরকে দেবী মনসার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রথম থেকেই তুলে ধরলেও বেহুলার পতিভক্তি স্নেহশীলতা, ধৈর্য্যশীলতা, একনিষ্ঠতা আখ্যানে মূখ্য হয়ে উঠেছে। মনসামঙ্গল কাব্যের রসকে শিক্ষিত নাগরিক সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই আখ্যানটি রচনা করলেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অভিনবত্বের দিকটি উঠে এসেছে অনেক ক্ষেত্রে। সেগুলি হল—

১. আখ্যানের প্রথম দিকেই আমরা পাই, চাঁদের স্ত্রী সনকা দেবীর কাছে সন্তান প্রার্থনা করে যার মাধ্যমে চাঁদ মনসা পূজা করতে উজ্জীবিত হবেন। এখানে মাতার সন্তান লাভের থেকে দেবীর পূজা প্রদানই মুখ্য হয়েছে সনকার কাছে। যার ফল স্বরূপ দেবী চাঁদ সদাগরের বিরোধিতা না করে বরং সদয় হবেন।

২. লখীন্দর জন্মানোর পর, চাঁদ সদাগর নিজে দৈবজ্ঞের কাছে জানতে পারেন লখীন্দ্ররের বাসর ঘরে সর্পাঘাতে মৃত্যুর কথা। প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্যে সনকার পুত্র লাভের সময় মনসা তাকে এই কথা বলেন।

৩. স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় বেহুলার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে। গত

সাতজন্ম ধরে সে বিবাহ রাত্রে স্বামীকে হারিয়েছে এবং দেখা যায় প্রতিবারেই স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হয়েছে। তাই লখীন্দর মারা যাওয়ার পরে বেহুলা মৃতদেহ সৎকার করতে বাধা দিয়ে কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলে। নিজেও স্বামীকে জীবিত করার সংকল্প নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যায়। আসলে চিতায় দগ্ধ হয়ে স্বামী প্রেমে শান্তি পাই না বেহুলা। প্রেমপিপাসা মেটানোর জন্য স্বামীকে ইহজন্মেই পেতে চেয়েছে সে। তাই স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য ব্রত নিয়েছেন বেহুলা। এই দিক দিয়ে আখ্যানকাব্যটি হয়ে উঠেছে নতুন মঙ্গলকাব্য, অর্থাৎ প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের আধুনিক নবনির্মাণ।

৪. মঙ্গলকাব্যের নবনির্মাণের আরেকটি পরিচয় পাই আমরা এই আখ্যানে। সেটি হল— নেতা ধোপানীর সঙ্গে দেব সভায় উপস্থিত হয় বেহুলা। সেখানে দেবকূলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখা যায়। দেবতারা সুন্দরী বেহুলা নাচুনীকে নৃত্যের কথা বলেন— নৃত্য দর্শনের আগ্রহ বশত নয়, বেহুলার স্বামীভক্তি পরীক্ষা করার জন্য। তবে বেহুলার এই নৃত্য একেবারে অন্য প্রকারের। বেহুলার এই নৃত্যের প্রভাবে দেবকূল কামাসিক্ত না হয়ে বরং পবিত্র হন। এই দিক দিয়ে গদ্য আখ্যানটিতে একটি অভিনবত্বের দিক উঠে এসেছে।

৫. 'বেহুলা'তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনটি হল শৈব চাঁদের ধর্মচিন্তার পরিবর্তনে স্বয়ং শিবের উদ্যোগ। শিব গতিত চর্ম শীর্ণকায় বৃদ্ধের ছদ্মবেশে এসে, চাঁদের মনসাপূজা না করার যে অহংবোধ তাকে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন। চাঁদের ধর্মবোধের যে কূপমুণ্ডকতা তা দূর করার চেষ্টা করেন এবং মনসাপূজায় নিয়োজিত করেন। প্রাচীন কবিদের কাব্য থেকে এই দিক দিয়ে সরে এসেছেন লেখক। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনভাবে উঠে এসেছে এই দিকটি।

৭. বেহুলার চরিত্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত রেখেছেন কবি। বেহুলার যে দীর্ঘ পথের সাধনা, তা তুলে ধরতে গিয়ে অতি-মানবিক দিকও উঠে এসেছে। বেহুলার ভেলা গলে পচে গেলেও দেবীর কৃপায় তা নতুন হয়ে ওঠে। আবার বেহুলার সৌন্দর্যের দিকটিও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বেহুলার পূর্বজন্মের কথা এবং তাঁর শরীরে শিবজ্যোতি: প্রসঙ্গটিও অভিনবত্বের দৃষ্টান্ত। বেহুলা ও শিব যেন একাকার হয়ে উঠেছে। সমালোচক সনৎকুমার নস্কর তাঁর 'প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা' গ্রন্থে বেহুলা সম্পর্কে আলোচনায় যা মন্তব্য করেছেন সেটি হল—

> ''লেখক বোধ হয় এ গদ্য রচনাটিতে সতীত্বের সেরা মূর্তি বেহুলার মানবিক দিকটির তুলনায় বড় করে তুলতে চেয়েছিলেন তার অতি-মানবিক সাধনার দিকটি, আর তাতে যে তাঁর সফলতা চূড়ান্ত স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে সে বিষয়ে

কোনও সন্দেহ নেই।”[৭]

আখ্যানের শেষভাগে বেহুলার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তা আমাদের বাল্মীকি রামায়ণের সীতার কথা মনে করিয়ে দেয়। বেহুলাও সীতার মতো নিজ সিদ্ধান্তেই সভাগৃহ থেকে বিদায় নেয়। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিদের যে মন্তব্য বেহুলার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে, সেখানে সমাজ চিত্রের দিকটি উঠে এসেছে।

প্রাচীন কবি দ্বিজ বংশীদাস এবং কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের পাঠকে অনুসরণ করে বেহুলা রচনা করলেও, গল্পের মধ্যে লেখক নিজের কল্পনা অতি সামান্যই প্রয়োগ করেছেন বলে স্বীকার করলেও, মনসামঙ্গল কাব্যকে আধুনিক গদ্যের রূপ দিতে গিয়ে এক নতুন আখ্যান রচনা করেছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন—

> ‘‘একটা দ্রব্যের রস স্বয়ং আস্বাদন করা এক কথা এবং অপরকে তুল্যরস রস-ভাগ প্রদান করিতে পারা, আর এক কথা।”[৮]

তাই বলা যায় প্রাচীন কাব্যকে অনুসরণ করলেও লেখকের অজান্তেই হয়ে উঠেছে মঙ্গলকাব্যের নবনির্মাণ। অন্যদিকে চাঁদ সদাগরকে প্রাধান্য না দিয়ে বেহুলার চরিত্র অঙ্গনে লেখকের বেশি আগ্রহ, আখ্যানটিকে আরো বেশি স্বতন্ত্র করে তুলেছে, যা লেখক নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন। তাই বলা যায় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মনসামঙ্গল কাব্যধারার নতুন রূপ দিতে গিয়ে হয়ে উঠেছে এক অভিনব পথের দিশারী।

তথ্যসূত্র:

১. দীনেশচন্দ্র সেন, পৌরাণিকী’, জিজ্ঞাসা, ১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা সংস্করণ, মার্চ ১৯৬৫ খ্রী:, পৃ. ৪

২. তদেব, পৃ. ২৭

৩. তদেব, পৃ. ৪৬

৪. তদেব, পৃ. ৬১।

৫. তদেব, পৃ. ৭৫

৬. তদেব, পৃ. ৮

৭. সনৎকুমার নস্কর, ‘প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা’, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ১৫.০৮.২০১২, পৃ. ২০৪

৮. দীনেশচন্দ্র সেন, পৌরাণিকী’ জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, প্রথম জিজ্ঞাসা সংস্করণ ১৯৬৫, পৃ.৫

*****